চোরাঘুর্ণি

দেবব্রত চৌধুরী

নৌকোর একচিলতে পাটাতনে চিত হয়ে শুয়ে বিড়িটায় একটা বড় দম নিয়ে গল গল করে আকাশের দিকে ধোঁয়া ছাড়ে নীলকণ্ঠ। সারা আকাশটায় মেঘ তার কালো চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ বিজলি চমকে গিয়ে কালো চাদরটাকে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। আজ প্রচণ্ড তুফান আসবে।

নৌকোয় ওরা তিনজন। নীলকণ্ঠ, দুধনাথ আর বুড়ো হাজিম মিঞা। নদী বেয়ে চাতলার খাড়িতে বেড়জালে মাছ ধরতে চলেছে ওরা। ঘর ছেড়ে বেরোবার সময় আকাশে এমন মেঘ ছিল না। সামান্য পেঁজা তুলোর মত আকাশে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এরকম দিনে মাছ মিলবে আশায় ওরা তিনজন নৌকো নামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওদের কাজে নামতে দেখে ছড়িয়ে থাকা মেঘগুলো ষড়যন্ত্র করে জোট বাঁধতে শুরু করেছে।

'ধুৎ.....'

নিভে যাওয়া বিড়িটাকে টেনে টেনে ফের জ্বালাতে ব্যর্থ হয় নীলকণ্ঠ। বিরক্ত মনে দূরে ছুঁড়ে ফেলে সেটাকে। আকাশের মেঘটার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা খারাপ হয়ে যায় তার।

'পুঙ্গির পুত্... ...'

বিড়বিড় করে মেঘের গোষ্ঠীর নামে একটা খিস্তি দেয় নীলকণ্ঠ। উল্টো দিকের শনশনিয়ে বয়ে আসা চটকা বাতাস খিস্তিটাকে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে, অন্য লগুইয়ে বসে থাকা বাকি দু'জন পালটা শুনতে পায় না।

'অ নীলু কীদা চিন্তা করতাছ?' গলুইয়ের মাথায় হালধরা বুড়ো হাজিম জিজ্ঞেস করে।

নীলকণ্ঠ উত্তর দেয় না। আকাশে মুখ রেখে চুপচাপ শুয়ে থাকে। নৌকোর কাছাকাছি জলের কোথাও বুদবুদের শব্দটা নীলকণ্ঠের মাথায় ক্রমাগত বাজতে থাকে। এই মুহূর্তে নীলকণ্ঠের মনে একরাশ চিন্তা ভিড় পাকায়।

ঘরের বাচ্চা ছেলেটার কী অসুখ, যতদিন যাচ্ছে শুকিয়ে কাঠ হয়ে হচ্ছে তত। রোগা ডিগডিগে পেটের উপর একটা মাংসের পাথর। দিনে দিনে দানা বেঁধে পোক্ত হচ্ছে সেটা।

নীলকণ্ঠ জানে তার নয়ান আর বেশিদিন নেই। মেডিকেলের ডাক্তার দেখেছে নয়ানকে। কী একটা নামও বলেছিল ডাক্তার। এটা সারাতে বড় অপারেশনের দরকার। নীলকণ্ঠের অবস্থা দেখেই কম চেয়েছে ডাক্তার। কিন্তু পাঁচশ টাকাই কোথায় পাবে নীলকণ্ঠ।

নয়ানের মাকেও দেখিয়েছিল মেডিকেলে। আর ছেলে পুলে হবার আশা নেই ওর। কলমীর বড় দুঃখ।

হরিণ টিলায় ক্ষীরোদ দাসের জালে কাজ করে নীলকণ্ঠরা। ওরা গাঙ, হাওর চষে মাছ ধরে আর ক্ষীরোদ সেগুলো পাইকারি রেটে শিলচর বাজারে চালান দেয়। মানুষটা খারাপ নয়, বেশ দয়ামায়া আছে লোকটার। তবে হিসেব মত কাজ না পেলে খুব কড়া।

আগে ওরা মহিমের জালে কাজ করত। লোকটা হারামি। পাই পয়সাও হিসেব ধরত। কথায় কথা বাপ বাপান্ত। বাধ্য হবে ছাড়তে হল ওকে।

আজ বছর প্রায় ক্ষীরোদ একদিন নীলকণ্ঠকে ডেকে আড়াই হাজার টাকার বেড়জালটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, নীলু, দিন দশ পুয়স্যা সুদে যেদিনকা জালডার পুরা দাম আমারে হমজাই দিতে পারবি হেদিন হ্যা জানিস জাল তোর।

নীলকণ্ঠ খুব খুশি হয়েছিল। ক্ষীরোদ যেন সেদিন তাকে একটা হারজিতের বাজি খেলায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আজও নীলকণ্ঠ সে খেলায় অক্লান্ত লড়াকু। চক্রবৃদ্ধির হারের সুদ-লাগাম ছাড়া ঘোড়ার গতি তার। তবু, নীলকণ্ঠ মরিয়া। এ পর্যন্ত সুদই শুধু দু'শো টাকার মত দেওয়া হয়ে গেছে, আর বাকিটা একদিন তুলে দিতে পারলেই — ব্যাস।

'তালডা তো সুবিধার দেহিনারে নীলু...,' বুড়ো হাজিমের কথায় চট্‌কা ভাঙে নীলকণ্ঠর। মাথার ভেতর এতক্ষণ ভাবনার মাকড়সা জাল বুনছিল। আকাশের দিকে তাকায়, আসন্ন যুদ্ধের সাজে গভীর হয়ে আছে মাথার উপর চাঁদোয়াটা।

দুধনাথ সবে আঠারোয় পা দিয়েছে। বাপ মারা যাবার পর এখন তাকেই একাজে নামতে হয়েছে। জেলে জীবনের তেমন বড় অভিজ্ঞতার এখনো সঞ্চয় করতে পারেনি। হাজিমের কথাটা ওর বুক কাঁপিয়ে দেয়। কোন রকম বলে, 'আইজকা ইন্দিরদা থাকলে ভালো আছিলো—যে জব্বর জলের টান, নাও হামাল দেওন দায় অইব।'

ওদের দলের চতুর্থজন ইন্দ্র আজ আসতে পারেনি। কদিন থেকে শূলের ব্যথায় বিছানায় কাত। ব্যথা চাগাড় দিলে কাটা পাঁঠার মত ছটফট করে। ঘন ঘন বমি হয় শুধু টক জল।

'ছ্যামারাডারে বড় কম বয়সো খারাপ বেরামে ধরল', হাজিম আপাশোস করে।

'ইডা বয়সের দুষ হাজুদ্দা...খুদার বেরাম...হুক্‌না পেডো দিন রাইত খাটিন গেলে জুয়ান হাত্তিরও শূল অয়।'

নীলকণ্ঠের গলায় চাপা ক্ষোভ। পাটাতনের উপর উঠে বসে এবার। জলের মধ্যে হঠাৎ একটা পাক খেতেই নৌকোটা ভীষণ টলে ওঠে।

'বাপরে।' দুধনাথের মুখ ছিটকে বেরোয়। হাজিম দক্ষ হাতে হাল ধরে নৌকো সামলায়। আবার সেটা স্রোতের টানে আগের মত চলতে থাকে।

নীলকণ্ঠ দুধনাথের দিকে তাকায়। তার কচি মুখটা ভয়ে আশঙ্কায় পাংশু হয়ে গেছে। অভাগা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কেন জানি নিজের কচি বয়সের মুখটা মনে পড়ে তার। বুকটা ব্যথায় টন টন করে। অজান্তেই হু-হু করে একটা দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে উঠে আসে। হাতের চেটোয় এক আঁজলা জল নদীর বুকে ছুড়ে দিয়ে বলে—

'—ইডাতো পয়লা দুধনাথ, জীবনে আর কত যে তুফান দেহন লাগব... ... ... ডরাইলে চলব ক্যারে?

দুধনাথ নীলকণ্ঠের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়।

'আমরা জাউল্লা মানুষ... ... ...নদীর সঙ্গে ঘর নদীর সঙ্গে জীবন মরণ তীরে ছাইড়্যা কেন্তে চাহন যায়—ক'?

নীলকণ্ঠের দার্শনিক কথাটা শুনে হালধরা হাজিম মাঝি হো-হো করে হেসে ওঠে।

আকাশের বুক চিরে বিজলি চমকায়। গুড় গুড় শব্দে মেঘ ডাকে। দূরে নদী থেকে হাওরের খাড়ি ভেঙে জল ঢোকার শব্দ আবছা শোনা যায়। মেঘ ঢাকা কালো আকাশের নীচে নদীর অশান্ত ঘোলা জলটা দেখতে দেখতে দুধনাথের মনটা কেমন হু-হু করে ওঠে।

'ও আমার দরদি আগে জাইনলে, তোর ভাঙ্গা নৌকোয় চড়তাম না... ... ।

আচমকা পরিবেশের নীরবতা ভেঙে দিয়ে হাজিম গান ধরে।

গান শেষ হয়। নীলকণ্ঠ আনন্দে তারিফ করে, 'তুমার গলাডা বড় মিঠায়ো হাজু ভাই, অমন হুন্দর গাওন জানতে ছাইড়্যা দিলায় ক্যারে?

—'গান গাওনের বড় ইচ্চা আছিলরে নীলু কিন্তু অবুঝ পেডোর জ্বালায় গান ভুইল্লা গেছি।'

কথাটা বলতে বলতে হাজিমের বুক ভার হয়ে আসে।

—বাতাসডাত্ বড় চট্কা মারেয়ো হাজুভাই... ... ...,' পরিবেশটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দেখে নীলকণ্ঠ প্রসঙ্গ পালটায়।

দূরের খাড়িতে জল ভাঙার শব্দটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। এমনি সাত পাঁচ কথা বলতে বলতে ওরা গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছোয়।

এই বাঁকটায় এসে নদীটা বেশ বিপজ্জনক। চারদিকে পাক খেয়ে খোলা জল নামছে ভীষণ শব্দে। এখানে স্রোতের টানটা আরো বেশি। হাজিম সাবধানে নৌকোটাকে পাড় লাগাতে থাকে। লগি নিয়ে দুধনাথও হাত মেলায়। ওর বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে থাকে। কিন্তু নীলকণ্ঠ নির্বিকার। কাঁধের গামছাটাকে কষে কোমরে বাঁধে। চোখের দৃষ্টি নদীর মুখ ভাঙা হাওরের খাড়িতে নিথর।

নৌকোটা পাড় লাগিয়ে ওরা ডাঙায় নামে। তারপর জালটার গোছগাছ করতে করতেই ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামে। সঙ্গে এলোমেলো দমকা হাওয়া। জোর হাওয়াতে দাঁড়াতে পারে না, দৌড়ে এসে খানিক দূরের বড় কালোহুজা গাছের নিচে গা বাঁচাতে চেষ্টা করে। পারে না, বাতাসটা যেন উড়িয়েই নিয়ে যাবে। অগত্যা গাছের গুঁড়িতে বালির উপর লম্বালম্বি শুয়ে পড়ে। বৃষ্টি বাতাসে উড়ে আসা ধুলো বালিতে শরীর মাখামাখি হয়ে যায়। এই অবস্থায় নীলকণ্ঠ তাকাবার চেষ্টা করে।

ওপারের গাছগুলো হাওরের দাপটে নাচছে। মাতাল করা শ-শ শব্দ। হাওয়ার তোড়ে নদীর বুকে ঢেউয়ের মাথায় অজগরের ফণা। পারের নৌকোটাকে লুফছে যেন।

'অভাবি মাইনষোর উপরে হালার হকুন দিষ্টি...সুবিধায় পাইলে আছাইড়্যা মারতে চায়...'বিড় বিড় করে অদৃশ্যজনের নামে গাল পাড়ে নীলকণ্ঠ।

প্রায় ঘন্টা খানেক তাণ্ডব নেচে ঝড়—বৃষ্টিটা দম নেয়। আকাশের মেঘগুলো পানসে হয় গেছে। আগের বড় বড় ফোঁটা থেমে এবারে ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামে।

নীলকণ্ঠরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। এখন ওদের বৃষ্টি ভেজা খোলা শরীরে লুকোচুরি খেলা রোদের ঝিলিক। শরীরের শিরায় শিরায় উষ্ণ উত্তাপ ভারি জালটা টানতে টানতে হাওয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

অনেকক্ষণ ধরে ওরা হাওরের মধ্যে জাল টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাছ তেমন পড়ে না। দু'চারটে বোয়াল আর মৃগেল ছাড়া বাকি সবই ছোট মাছ।

বুড়ো হাজিম আপশোস করে, 'ধুর' এমনটা জানলে আইজকা ঘরথ্যা বারাইতাম না।'

আপশোস নীলকণ্ঠেরও, কিন্তু সে হতাশ নয়। জলের দিকে দৃষ্টি রেখে বলে, 'খাড়াও হাজু ভাই, বড় মাছ আইজকা লাগাইমুই, নাওখান বার কইর‍্যা হাওরের মুখো নেওন লাগে।'

নীলকণ্ঠ এবারে ক্ষেপে যায়, 'জানের অত দরদ তো আইলে ক্যারে, যা ঘরোর মার বুক চুষগা যা।'

দুধনাথ মরমে মাথা নোয়ায়। নীলকণ্ঠদা বড় বদরাগি মানুষ। কারো বিপদে যেমন ঝাঁপ দিতে পারে তেমনি, রেগে গেলে কাকে কী বলে হুঁশ রাখে না।

নীলকণ্ঠ বুঝতে পারে দুধনাথ ব্যথা পেয়েছে। অমনি সে তার ভারী হাত দিয়ে দুধনাথের পিঠে চাপড়ি মেরে বলে, 'কি রে গুসা?'

অভিমানে দুধনাথের দু'চোখ ফেটে বুঝি জল বেরোয়। জলটা লুকোবার জন্য অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

'ধুর ছামড়া,...,' নীলকণ্ঠ দরাজ হেসে উঠে, 'তুই একডা মরদ জুয়ান, মাইয়্যা মাইষের মতন একজনের কথায় কান্দে?'

এরপর নীলকণ্ঠর গলাটা আপনা থেকেই নিস্তেজ হয়ে আসে, 'বুইলে দুধনাথ আমার যে জিদ উড়ছে, মাছ আমার পাওন লাগে—মাথার উপরে আমার যে কতখানি দেনারে ... হেই তুই.....'

দুধনাথ নীলকণ্ঠের দিকে তাকায়। বিষণ্ণ দৃষ্টি তখন বর্ষার ঘাঘরা পেরিয়ে অনেক দূরে। কী যে হয় দুধনাথের; নৌকোর পাকা লগিটা মুখোয় পাকিয়ে নৌকোর পাটাতনে লাফ দিয়ে নামে, প্রায় চেঁচিয়েই বলে, বড় মাছ আইজ'কা আমারো পাওন লাগে গো নীলুদা....

সাবধানে লগি ঠেলে হাজিম নৌকোটাকে হাওরর মুখে নিয়ে আসে। নদীর বুক থেকে হাওরের সরু মুখ ভেঙ্গে জল ঢুকছে হু-হু করে। খোলা জলে তাই দূরন্ত কুণ্ডলী। তার চারপাশে আপাত স্থির জলের তলায় ভয়ঙ্কর ঘুর্ণি।

হাজিম লগিতে ভর দিয়ে নৌকোটাকে হাওরের পাড়ে ভিড়িয়ে রেখে রেখে ঘোরায়। নীলকণ্ঠ আর দুধনাথ নৌকো থেকে সাবধানে জালটা বিছিয়ে দেয় জলে। শলাগুলো গোল হয়ে ভাসতে থাকে জলের উপর। হাজিম তারপর নৌকোটা টেনে নিয়ে যায় হাওরের ভেতর। কাছিতে টান পড়ে জাল গুটিয়ে আসে। এভাবে বেশ মাঝ ধরা পড়তে থাকে।

কিন্তু নীলকণ্ঠ আজ মরিয়া। বড় মাছ আজ তার চাই। ভারি ওজনদার মাছ একটা ক্ষীরোদকে সমঝে দিয়ে মাথার ভারটা হালকা করতে চায় সে।

হঠাৎই ওদের চোখ বড় বড় হয়ে যায়। জালটা জলে বিছানো ছিল। একটা ভারী টান বোধহয় এবারে। হাজিম লগি ঠেলে নৌকোটাকে হাওরের ভেতর নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কাছিটা সরে আসে না। নীলকণ্ঠের রক্তে আগুন লাগে যেন। বুকের শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়। এ মাছ কিছুতেই জাল

ছাড়া হতে দেবে না। গলুইয়ের মাথায় উবু হয়ে বসে উসখুস করে। তারপর হঠাৎই কোমরের গামছা কষে নিয়ে স্রোত ভরা নদীতে ঝাঁপ দেয়। জলের তলানি আন্দাজ করে বড় একটা ডুব দেয়।

নৌকোর পাটাতনে চূড়ান্ত প্রতীক্ষা। প্রতিটা মুহূর্ত উত্তেজনার। দুধনাথ আর বুড়ো হাজিমের বুকে শ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুত ওঠানামা। জালটা ঢিলে হয়ে আসে একসময়। দুধনাথ কাছিটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে। হাজিম লগি ঠেলে ধীরে ধীরে নৌকাটাকে হাওরের ভেতরে নিয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত জালটা নৌকোয় উঠে আসে। হাজিম আর দুধনাথ হাত মিলিয়ে জালটা পাটাতনে তুলে দেয়। প্রায় কেজি কুড়ির বোয়াল একটা। ওদের চোখে খুশি উথলে ওঠে। আনন্দে দুধনাথ জালে পেঁচানো মাছটাকে জাপটে ধরে।

'আল্লার কসমরে দুধনাথ, কওদিনে একডা বুয়াল ধরন গেল জানে... ...,' বুড়ো হাজিমের মুখে একগাল হাসি ছড়িয়ে যায়।

'ও-মা-আ-আ-বা-চা-ও-অ-অ... ... ...'

আচমকা চিৎকারে আনন্দটা মুহূর্তেই খান খান হয়ে যায়।

হাওরের মুখে দূরন্ত কুণ্ডলীতে পড়েছে নীলকণ্ঠ। চোরাঘূর্ণির গ্রাস। তবু বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করে। আপাত স্থির জলের নিচে মারাত্মক চোরাটানে একটু একটু করে অদৃশ্য হতে থাকে নীলকণ্ঠ।

হাত কয়েক তফাতে একটা মানুষ মৃত্যুর কোলে অসহায়। হতাশ ভঙ্গিতে তাকায় দুজনে। এই মানুষটা ওদের দলের সর্দার। মাথার উপর ঋণের বিরাট দায় নিয়ে মানুষটা ওদের নিত্যদিনের সুখ দুঃখের সঙ্গী। ভাবতে পারে না হাজিম মাঝি। দুধনাথ লগি ঠেলে প্রাণপণ শক্তিতে। তীব্র বেগে নৌকো ছুটে হাওরের মুখে। বুড়ো হাজিম শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে কাড়া দিয়ে জাল থেকে মাছটা ফেলে পাটাতনে। পেঁচানো জালটা শেষতক ছুঁড়ে দেয় ঘূর্ণির মুখে।

প্রায় অন্তিম মুহূর্তে জালটা জাপটে ধরে নীলকণ্ঠ। ওরা দুজন প্রাণ উজাড় করা শক্তি দিয়ে জালটাকে নৌকোয় তুলে দেয়।

নৌকোটা পাড়ে লাগিয়ে ওরা ধরাধরি করে নীলকণ্ঠকে ডাঙ্গার উপর শুইয়ে দেয়। অচেতন হয়ে থাকে দেহটা। ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাস। হাজিম ওর বুকে ধীরে ধীরে দলাই দিতে থাকে।

প্রায় সন্ধের সময় জ্ঞান ফিরে নীলকণ্ঠের। শরীর বড্ড অসাড়। আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে। আবার চারপাশ জুড়ে অন্ধকার নামছে। ধীরে ধীরে উঠে বসে নীলকণ্ঠ। হাজিম আর দুধনাথের কাঁধে ভর রেখে নৌকোয় উঠে আসে।

উজানের দিকে হাওয়া দিচ্ছে জোর নৌকোটা তরতর করে এগোয় ঘর মুখো। গলুই-এর মাথায় দাঁড়ে মাঝে মাঝে টান দেয় হাজিম মাঝি। দুধনাথ অন্য গলুইয়ে দু'হাটুতে মাথা রেখে চুপচাপ বসে থাকে।

অন্ধকার আরো ঘন হয়ে জমে। নৌকোয় শরীরগুলো শুধু ছায়ার মত। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। শুধু শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। নীলকণ্ঠ পাটাতনে চিত হয়ে শুয়ে। পাশেই জাল ঢাকা অর্ধচেতন বোয়ালটা। মাঝে মাঝে ওর ঠাণ্ডা পা নীলকণ্ঠের শরীরের সঙ্গে ছোঁয়াছুয়ি হয়ে যাচ্ছে।

ক্ষীরোদ আগের মত এটাকে দিয়েও ভাল দাম পাবে। কালকের ভোরের লরিতেই মাছটা চলে যাবে শিলচর বাজারে। শহরের মৎস্য প্রিয় বাবুরা সব ভিড় করে দেখবে অতবড় বোয়ালটাকে। ক্ষীরোদ চড়া দাম ধরবে প্রতিটি কেজির উপর। পুরোনো বোয়ালের স্বাদ যে অনেক।

কিন্তু ফিরে এসে ঠিক আগের মতোই মনমরা হয়ে বলবে, 'নারে বুয়ালের রেইট বড় কম।' (সে সময় বিশেষে সব মাছেরই দাম কমে যায়)।

কিন্তু নীলকণ্ঠ ঠিক জানে, মাস দুয়েক পরই মনের বাসনা মত রান্না ঘরে টিন উঠবে ক্ষীরোদের। দশহরা পূজা হবে ঘটা করে। কথাগুলো ভাবতে গিয়ে মাথাটা চিড়বিড় করে উঠে। মাথার ভেতরে চক্রবৃদ্ধি হারে জমানো ঘোড়ার বাচ্চাগুলো ক্ষুর বাজিয়ে নাচতে থাকে।

নীলকণ্ঠ বুঝতে পারে তার অসাড় শরীর দেহমনে কোথায় যেন একটা আগুন তিলতিল করে জন্ম নিচ্ছে। সেই আগুনের পিণ্ডটা তালগোল পাকাতে পাকাতে সমস্ত শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি করেছে। নিজের অজান্তেই হাত দুটো মুঠো হয়, খোলে। ধীরে ধীরে নীলকণ্ঠ পাটাতনে উঠে বসে।

দুধনাথ গলুইয়ের মাথায় কুঁকড়ে শুয়ে আছে। অন্য মাথায় হাল ধরা হাজিম মাঝি নিজের মধ্যে বিভোর। নীলকণ্ঠ উবু হয়ে নিঃশব্দে অর্ধচেতন বোয়ালটাকে দুহাতে তুলে নেয়। তারপর উবু হয়ে নিঃশব্দেই মাছটাকে নদীর জলে নামিয়ে দেয়। ঘাঘরা কলকল শব্দে হেসে ওঠে। বাকিরা কেউ কিছু টের পায় না। নীলকণ্ঠ পাটাতনে শুয়ে পড়ে ফের।

নেতৃত্বের এই সমঝোতার সরল অঙ্ক নিখিলেশ বুঝতে পারলেও, মানতে পারেনি। সেই থেকে সেও না-ছোড় হয়ে লেগেছে নোওদের পেছনে। প্রতিটি মিটিং-এর এ নিয়ে প্রশ্ন সে তুলবেই। ঢেউয়ে ভেসে-যাওয়া নৌকো সে ভাসাতে চায়নি কখনও। চায়নি নিরীহ শ্যাওয়ার মতো ভেসে থাকতে। ওদিকে নেতারাও নিখিলেশকে মাথাগরম এবং একগুঁয়ে প্রমাণ করতেই আগ্রহী। তাই তাকে কেউ বেশি ঘাটায় না। অথচ সে তার সহকর্মীদের নির্জীব ফ্যাকাশে চোখের দিকে তাকালেই কাদের যেন অট্টহাসি শুনতে পায়। সেই অট্টহাসিতে মনে হয়, তার অফিস বাড়ির প্রতিটা ইট পাথর থাম একে ভেঙে পড়বে তার উপর।

অফিসে পৌঁছে নিখিলেশ জানতে পারে, আজ তাদের সার্কেল চিফ এসেছেন। প্রশাসনের তরফে চিফের সাথে আলোচনায় বসার এবং বিক্ষোভ কর্মসূচী তুলে নেবার অনুরোধ এসেছে। অতঃপর আজ আর কোনও বিক্ষোভ দেখানো হবে না। সেই অট্টহাসি আবার শুনতে পায় নিখিলেশ। নেতারা তাকে এড়িয়ে চলে। তাই কারো কাছ কোনও সদুত্তর না পেয়ে, সে স্থির করে, সেও বিকেলে সার্কেল চিফের মিটিং-এ যাবে। আজ সে বুঝতে চায় সরল অঙ্কের হিসেবটা কেমন। সাপ-লুডোর দান কী করে সাপের মুখেই পড়ে যায়, আর অন্তহীন গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকে এতদিনের প্রস্তুতি। যেন এক মুঘল-পর্ব শেষে ক্লান্তিতে জানু ভেঙে লুটিয়ে পড়ে ধুলোয়।

চিফের সাথে মিটিং-এ যেতে কেউ তাকে ডাকেনি। একরকম গায়ে পড়েই ঢুকে পড়া। শুরুতেই চিফ ওদের ধমকের সুরে বললেন,—আলোচনার আগেই এভাবে আন্দোলন শুরু করা আপনাদের উচিত হয়নি। জানেন, এজন্য আমি শাস্তি দিতে পারি?

ব্যস, শুরু হয়ে গেল তো-তো। একজন বললেন,—স্যার, আপনি জানেন না স্যার আমরা কত কষ্ট করে কাজ করি। অথচ আমাদের কোনও ওভার টাইম দেওয়া হচ্ছে না, স্যার।

চিফ সঙ্গে সঙ্গে সুপারকে জিজ্ঞেস করলেন,—হোয়াট ইজ দ্যা অ্যামাউন্ট টু বি পেইড অন ও.টি.এ?

সুপার চিফের কানে কানে কিছু একটা বললেন। চিফ মুচকি হেসে বললেন,—ঠিক আছে, এখন অর্ধেকটা দিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর আরেকজন বললেন, স্যার আমাদের মেডিকেল বিল, অনেকদিন ধরে পড়ে আছে স্যার। আমরা কষ্ট করে পরিবারের অসুখ বিসুখ নিয়ে সংসার চালাচ্ছি স্যার।

চিফ এবার আর রাগ সামলাতে পারেননি। চেয়ারের হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে বললেন বাট্ মোস্ট অফ দ্য বিলস্ আর অফ ডাউটফুল জেনুইননেস অ্যান্ড ইউ নো ইট ওয়েল।

তখন সবাই সমস্বরে বলতে লাগল,—নো স্যার। নো স্যার। নো স্যার।

চিফ আবার সুপারকে জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াট ইজ দ্যা অ্যামাউন্ট টু বি পেইড অন মেডিকেল বিলস্?

সুপার চিফের কানে কানে কিছু বললেন। চিফ মুচকি হেসে বললেন,—ঠিক আছে, খুব জরুরি বিলগুল দিয়ে দেওয়া হবে।

এমন সময় নিখিলেশ হঠাৎ, চীৎকার দিয়ে বলে উঠল—ইউ পিপল্ আর ইকুয়ালি করাপ্ট।

ঘরের ভেতর সবাই নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছে। চিফ আবার সুপারকে জিজ্ঞেস করলেন,—হোয়াট ইজ দ্যা নেম অফ দিস বয়? পুট হিম আন্ডার সাসপেনশন।

নিখিলেশ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অট্টহাসিটা আবার শুনতে পায়। কেউ হয়তো কিছু বলতে গিয়েছিল, তখনই চিফকে বলতে শোনা গেল, দিস ইজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল কেস অ্যান্ড সার্ভিস ইউনিয়ন ইজ নট এ্যালাউড টু ডিসকাস সাচ কেস।

অফিস থেকে রাস্তায় নেমে নিখিলেশ দেখতে পায় এক ভিখারি দম্পতি উল্টোদিকের ফুটপাতে বসে গান গাইছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সর্বাঙ্গে আগুনে পোড়া দাগ। স্বামীটি অন্ধ। তাদের গলাটি খুবই সুরেলা। অনেকটা দূর থেকেও নিখিলেশ তাদের গান শুনতে পাচ্ছিল।

আমি কি রকমভাবে বেঁচে...

সে রিক্সা থেকে নেমে অফিসে ঢুকছে। এমন সময় দেখতে পেল এক ভিখারি দম্পতি উল্টো দিকের ফুটপাতে বসে গান গাইছে। কি মনে করে তাদের সামনে পাতানো গামছায় একটা টাকা ছুঁড়ে দিল। আজ তার চাকরির প্রথম দিন। একে তাকে জিজ্ঞেস করে যখন সে ডেপুটি বাবুর টেবিলে পৌঁছল, তখন অনেকেই তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম কী। সে বলল নিখিলেশ। তখন সবাই অবাক হয়ে বলাবলি করতে লাগল, কী রকম কাকতলীয় ব্যাপার। একজন নিখিলেশ সাসপেন্ড হয় চলে গেল আবার আরেকজন নিখিলেশ নতুন চাকরিতে জয়েন করল।

চাকরির প্রথম দিনটা নিখিলেশের কাছে ভীষণ উত্তেজনার ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রকের অধীন এই অফিসটা। চারদিকে এত এত বেকারে ভিড়ে, আজ থেকে সে আলাদা,—এটাই তার মনে হতে লাগল বারবার। গোটা দিনটা অবিশ্বাস্য দ্রুততায় উড়ে গেল।

বিকেলের আড্ডায় বন্ধুরা চেপে ধরল, খাওয়াবার জন্য। সবাই মিলে রেস্টুরেন্টে হৈ হৈ করে খাওয়া দাওয়া হল। এরমধ্যে একজন বলল,—দশটা বাজতে চলল। এবার ওঠা যাক।

অন্যরাও তখন বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিখিলেশ অবাক হয়ে গেল। এরই মধ্যে দশটা বেজে গেছে। আজ কি দিনটা কুড়ি ঘণ্টার হয়ে গেল নাকি? আজ সে ঘনঘন লোডশেডিং বা ড্রেনের দুর্গন্ধ বা মশার কামড় কিছুই টের পাচ্ছে না। দিনটা অবিশ্বাস্য দ্রুততায় উড়ছে।

বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল। সারাদিনের উচ্ছ্বাস তাকে কিছুটা ক্লান্ত করেছে, এটা টের পেতে সে তলিয়ে যায় ঘুমে।

সকালে বিছানায় বসে চা খেতে খেতে আগের দিনের পত্রিকাটা পড়ছিল। এখানে কাগজে আসে বিকেলে। কলকাতার প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট থেকে এই পত্রিকা তার বাড়ি আসতে, বিকেল পেরিয়ে যায়। বাড়িতে পত্রিকা আসার পরই চলে যাবে বাবার হাতে। তারপর দাদা। একফাঁকে বৌদি এসে দেখে যাবে সিনেমার খবর, দূরদর্শনের সময়সূচি।

একদিনের পুরোনো পত্রিকাটা চা খেতে খেতে বিছানায় আয়েস করে বসে পড়ে। এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কত ঘটনা ঘটে গেছে। যেমন সে নিজেও আজ আর বেকার নয়। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে পত্রিকাটা ভাঁজ করে রাখছে, এমন সময় ভাইপো পিকলু এসে বলল,—কাকু, আমাকে Aim in life লিখে দেবে?